নারী: ইসলামের পূর্বে ও পরে

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

মুতয়েব উমার আল-হারেসী

৪০৩

অনুবাদ: জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

المرأة في المجتمع العربي الجاهلي

متعب عمر الحارثي

ترجمة: ذاكرالله أبو الخير

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বর্তমানে নারীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরণের লেখালেখি ও ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য সংগঠন গজিয়ে উঠেছে। নারী অধিকার, নারীনীতি, সমানাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সমগ্র বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠেছে অসংখ্য সংগঠন, সংস্থা। এরা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা নামে কাজ করলেও মূলত নারী অধিকার বলতে তারা কি বোঝাতে চাচ্ছে, তা আদৌ স্পষ্ট নয়। নারী অধিকার দ্বারা যদি এ কথা বুঝায় যে, নারী ও পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা নিশ্চিত করা, নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য না করা, উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, পশ্চিমা নারীদের মতো তাদেরও অধিকার নিশ্চিত করা, তাহলে আমরা বলব, আপনাদের সাথে আমাদের কোনো বিতর্ক নয়। আপনারা

আপনাদের মত করে কাজ চালিয়ে যান। যারা আপনাদের ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে পা দেবে তারা তাদের পরিণতি সম্পর্কে অচিরেই বুঝতে পারবে। কারণ পশ্চিমা নারী আজ তাদের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজেদের বেঁচে থাকার উপায় খুঁজছে। তাদের অশান্তি আত্ম-কলহ এতই চরমে যে, তাদের দেশে নারীদের আত্মহত্যা করার প্রবণতা বাড়ছে। তারা তাদের জীবনের প্রতি খুবই বিতৃষ্ণ। পশ্চিমা দেশের সচেতন নারীরা তাদের ভোগবাদী ও পশুত্বের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় নিচ্ছে। ফলে পশ্চিমা দেশগুলোতে পুরুষদের তুলনায় নারীদের ইসলাম গ্রহণের হার অধিক। কারণ, তাদের দেশে তথাকথিত নারী স্বাধীনতা থাকলেও কিন্তু তাদের দেশে নারীর আসল মর্যাদা যা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

মূলতঃ আল্লাহ তা'আলাই নারীদের জন্য তাদের প্রকৃত সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছেন। আমরা পর্যালোচনা করে দেখতে পাই যে, নারী ও পুরুষ কখনোই সমান হতে পারে না। কোনো ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও মর্যাদা বেশি আবার কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের অধিকার ও মর্যাদা বেশি। কিছু কাজ আছে, যেগুলো নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা পুরুষরা করতে সক্ষম নয়, আবার কিছু আছে, যেগুলো পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নারী ও পুরুষদের এ ধরণের ক্ষেত্র বিশেষ পার্থক্যকে অস্বীকার করার কোনো ভিত্তি নাই। যারা এ বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা কোনো অবিবেচকের কাজ হবে না।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবরা নারীদের প্রতি বিষম বৈষম্য প্রদর্শন করত। তাদের তারা মানুষ হিসেবে গণ্য করতেও সংকোচ করত। তাদের উপর চলত অমানবিক নির্যাতন। কিন্তু ইসলাম এসে নারীদের প্রতি

কি ধরণের সম্মান দেয়, তার একটি পর্যালোচনা এ নিবন্ধে তুলে ধরা হলো।

জাহেলিয়্যাতের যুগে আরব সমাজে নারীদের অবস্থান ও তাদের প্রতি ইসলামের অনুগ্রহ:

আরবদের ইতিহাস হলো, তারা নিজেদের আত্মমর্যাদা ও ইজ্জত সম্মানের দিকটি অধিক বিবেচনা করার কারণে, তাদের নারীদের প্রতি কোনো প্রকার অশুভ ও অসম্মানজনক আচরণ হতে পারে এ আশঙ্কায় তারা তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করে ফেলত। বিশেষ করে, তাদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত পরিবার বলে পরিচিত ছিল, তারা তাদের সম্মান ও মর্যাদাহানিকে কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারত না। তাই তারা মনে করত, তাদের নিকট কন্যা সন্তানদের হত্যার কোনো বিকল্প নাই। অন্যথায় তাদের পদে পদে অসম্মান হতে হবে। তাদেরই এক শ্রেণির লোক এমন ছিল, যাদের নিকট তুলনামূলক

কিছুটা হলেও নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার প্রচলন ছিল; কিন্তু এ অবস্থাও বিভিন্নভাবে নারীদের অধিকারকে ঘোলাটে করে ফেলত এবং তাদেরকে তাদের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত করা হত। ফলে এক কথায় বলা চলে তৎকালীন আরব সমাজে নারীর অধিকার বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। প্রতিনিয়তই তাদের ইজ্জত ও সম্মান লুণ্ঠিত হত এবং তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হত। জাহেলিয়্যতের যুগে নারীদেরকে তাদের উত্তরাধিকারী সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হত। তাদেরকে সাধারণত কোনো সম্পদের মালিক করা হত না, যার কারণে জাহেলিয়্যাতের যুগে আরবের নারীদের মালিকানা বলতে কিছুই ছিল না।

আর ইসলামের আগমনের পর ইসলাম নারীদের জন্য উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে তাদের অধিকার নিশ্চিত করে এবং সম্পত্তিতে তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে।

জাহেলিয়াতের যুগে স্বামীর তালাক অথবা মৃত্যুর পর তার পছন্দানুযায়ী অপর কোনো পুরুষের নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নারীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ফলে একজন নারী তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামীহারা হলে তাকে অসহনীয় যন্ত্রণা ও সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হত এবং তাকে বাধ্য হয়ে অতি কষ্টে কালাতিপাত ও জীবন-যাপন করতে হত।

কিন্তু ইসলাম নারীদের এ দুর্ভোগের প্রতিকার করে তাদের লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার হাত থেকে উদ্ধার করেছে। ইসলাম তাদের পুনরায় নতুন জীবন শুরু করার সুযোগ করে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢﴾ [البقرة: ٢٣٢]

“আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছবে তখন তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বিয়ে করবে যদি তারা পরস্পরে তাদের মধ্যে বিধি মোতাবেক সম্মত হয়। এটা উপদেশ তাকে দেওয়া হচ্ছে, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটি তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধ ও অধিক পবিত্র। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩২]

জাহেলিয়্যাতের যুগে নারীরা তাদের নিজদের ধন-সম্পদ নিজেরা ভোগ করতে পারত না। তাদের সম্পত্তিতে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। ফলে তারা ইচ্ছা করলেও তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারত না। মোহরানা হিসেবে তাদের যে টাকা (অর্থ কড়ি) দেওয়া হত, তাও স্বামীরা তাদের থেকে আত্মসাৎ করে নিয়ে নিত। তারা নারীদের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপ করত ও

তাদের ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে তাদেরকে গৃহাভ্যন্তরে আটক করে রাখত। ফলে তারা অন্য কোনো স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না।

কিন্তু ইসলাম আসার পর নারীদের ওপর এ ধরণের অবৈধ হস্তক্ষেপ ও অনধিকার চর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়, নারীরা তাদের সম্পত্তিতে তাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করা এবং পছন্দমত বিবাহ করার অধিকার ফিরে পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩﴾ [النساء : ١٩]

“হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিশ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ

তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেওয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

জাহিলিয়্যাতের যুগে নারীরা তাদের স্বামীদের পক্ষ হতে নানাবিধ নির্যাতন, বৈষম্য ও অবহেলার স্বীকার হত। নারীরা তাদের স্বামীদের পক্ষ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশুভ আচরণের মুখোমুখি হত। আবার কখনো কখনো তারা নারীদেরকে একটি অনিশ্চিত জীবনের দিকে ঠেলে দিত। তাদের তালাকও দিত না আবার স্ত্রীরূপে তাদের মেনেও নিত না, বরং তাদের ঝুলিয়ে রাখত। এটি ছিল তাদের জন্য একটি অবর্ণনীয় দুরবস্থা; যার প্রতিকার একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। ইসলাম স্ত্রীদের সাথে এ ধরণের অশালীন ও অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকার

নির্দেশ দিয়েছে এবং এ ধরণের আচরণকে চিরতরে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩﴾ [النساء : ١٢٩]

“আর তোমরা যতই কামনা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে কখনো পারবে না। সুতরাং তোমরা [একজনের প্রতি] সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে তোমরা [অপরকে] ঝুলন্তের মত করে রাখবে। আর যদি তোমরা মীমাংসা করে নাও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৯]

আর জাহেলিয়্যাতের যুগে কিছু কিছু খাদ্য এমন ছিল, যা শুধু পুরুষরা খেতে পারত নারীরা খেতে পারত না।

নারীদের জন্য তা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। আল্লাহ তাদের এ ধরণের বৈষম্যের সমালোচনা করে বলেন,

﴿وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ خَالِصَةٞ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِنَاۖ وَإِن يَكُن مَّيۡتَةٗ فَهُمۡ فِيهِ شُرَكَآءُۚ سَيَجۡزِيهِمۡ وَصۡفَهُمۡۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٞ ١٣٩﴾ [الانعام: ١٣٩]

“আর তারা বলে, এই চতুষ্পদ জন্তুগুলোর পেটে যা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর যদি তা মৃত হয়, তবে তারা সবাই তাতে শরীক। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের কথার প্রতিদান দেবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৩৯]

এ ছাড়াও তাদের বিবাহ করার কোনো নির্ধারিত সংখ্যা ছিল না। তারা তাদের ইচ্ছামত একাধিক বিবাহ করত এবং দুই বোনকে একত্রে এক সাথে বিবাহ করা তাদের সমাজে নিষিদ্ধ ছিল না। ইসলামের আগমনের পর দু

বোনকে একত্র করা এবং এক সাথে চারের অধিক বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়। যার ফলে পুরুষদের জন্য যা ইচ্ছা তা করার যে একটা প্রবণতা তাদের সমাজে অব্যাহত ছিল, তা একটি নিয়মনীতি আওতায় চলে আসে এবং তাতে নারীদের দুশ্চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣﴾ [النساء : ٢٣]

“তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে, তোমাদের মেয়েদেরকে, তোমাদের

বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, ভাতিজীদেরকে, ভাগ্নিদেরকে, তোমাদের সে সব মাতাকে যারা তোমাদেরকে দুধ-পান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোনদেরকে, তোমাদের শাশুড়িদেরকে, তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ সেসব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদেরকে, আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলিত না হয়ে থাক তবে তোমাদের উপর কোনো পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং দুই বোনকে একত্র করা (তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৩]

তাদের মধ্যে আরেকটি বর্বরতা ও কুসংস্কার বিরাজ করছিল যে, পিতা তার স্ত্রীদের তালাক দিলে, অথবা মারা গেলে সন্তানরা পিতার স্ত্রীদের বিবাহ করতে পারত। এ

ধরণের মানবতা বিরোধী ও ঘৃণিত কাজটি করতে তাদের সমাজে কোনো অপরাধ ছিল না এবং তারা কোনো প্রকার দ্বিধা-বোধও করত না। তবে ইসলামের আগমনের পর আল্লাহ তা'আলা এ ধরণের নিন্দিত ও ঘৃণিত কাজটিকে চিরতরে রহিত করে দেন এবং হারাম ঘোষণা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢﴾ [النساء : ٢٢]

"আর তোমরা বিবাহ করো না নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (তা ক্ষমা করা হলো)। নিশ্চয় তা হলো অশ্লীলতা ও ঘৃণিত বিষয় এবং নিকৃষ্ট পথ।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২২]

জাহেলিয়াতের যুগে জীবজন্তু ও ধন সম্পদ যেভাবে মিরাসের সম্পত্তি হওয়ার যোগ্য অনুরূপভাবে নারীরাও ধন সম্পদের মত মিরাসের সম্পত্তি রূপে পরিগণিত হত।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের কারো পিতা মারা গেলে অথবা তার সহযোগী কেউ মারা গেলে, তার স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ব অন্যদের তুলনায় তারই বেশি হত। সে ইচ্ছা করলে তাকে আটকে রাখতে পারত অথবা তার মোহরানা বা ধন-সম্পত্তি দ্বারা মুক্তিপণ না দেওয়া পর্যন্ত তাকে করায়ত্ত করে রাখতে পারত অথবা তার মৃত্যু পর্যন্ত ধরে রাখতে পারত। আর যখন মারা যায় তখন সে তার ধন-সম্পদসহ যাবতীয় সবকিছুর মালিক হত।

আতা ইবন আবি রাবাহ বলেন, জাহেলিয়্যাতের যুগে যদি কোনো মানুষ মারা যেত, তখন তাদের মধ্যে কোনো ছোট বাচ্চা থাকলে, তার লালন-পালনের জন্য তার

পরিবারের লোকেরা স্ত্রীটিকে আটক করে রাখত। অন্য কোথাও বিবাহ বসার অনুমতি দিত না।

আল্লামা সুদ্দী রহ. বলেন, জাহেলিয়্যাতের যুগে পিতা, ভাই বা ছেলে মারা যাওয়ার পর, মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের থেকে যে সর্বাগ্রে তার উপর স্বীয় চাদর রাখতে পারত, সেই তার স্বামীর দেওয়া মোহরের বিনিময়ে তাকে বিবাহ করা অথবা অপরের নিকট বিবাহ দিয়ে তার মোহরের মালিক হওয়ার সর্বাধিক বেশি হকদার। আর যদি মহিলাটি তার উপর কাপড় ফেলার পূর্বে সে তার পরিবারের নিকট চলে যায়, তাহলে সে নিজেই তার নিজের যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখত!

একটু ভেবে দেখুন কি এক অদ্ভুত ছিল তাদের জীবন ব্যবস্থা ও সামাজিক রীতিনীতি। বিশেষ করে তাদের নারীদের জীবন ব্যবস্থা ও তাদের জন্য আরোপিত আইন কানুন।

জাহেলিয়্যতের যুগে তালাকের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না। যে যত পারত সে তার স্ত্রীদের ততই তালাক দিত পারত। কিন্তু ইসলাম তালাককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তালাকের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়। সুতরাং এখন আর নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত তালাক দেওয়া ও নারীদের নিয়ে তামাশা করার যাবতীয় পথ বন্ধ করে দেয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩﴾ [البقرة: ٢٢٩]

“তালাক দুইবার। অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নেবে। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে,

আল্লাহর সীমারেখায় তারা অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই যালিম।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২৯]

জাহেলিয়্যাতের যুগে আরবদের কন্যা সন্তানদের প্রতি এতই অনীহা ছিল যে, তারা তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করতেও কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ করত না। অনেক আরব পিতারা কন্যা সন্তানদের নিজ হাতে হত্যা করে নিজেদের কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করত। এ ধরণের ঘটনা তাদের সমাজে ছিল অসংখ্য।

তাদের সামাজিক অবয়ের এহেন নাজুক মুহূর্তেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। ইসলাম তাদের সামাজিক অবক্ষয়ের মূলোৎপাটন করে এবং তাদের আলোর পথের

সন্ধান দেয়। আরবরা বিভিন্ন কারণ তাদের সন্তানদের হত্যা করত। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কারণে তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করত।

অপমান ও আত্ম-মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় তারা তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করত।

আবার তাদের মধ্যে কতক এমন ছিল, যারা তাদের কন্যা সন্তানের কান-নাক কাটা, অত্যধিক কালো, অন্ধ, খোঁড়া, বোবা ও বধির হওয়ার কারণে হত্যা করত। কারণ, তারা মনে করত এ সব দোষ তাদের জন্য দুর্ভোগ ভয়ে আনবে।

কখনো কখনো কোনো কারণ ছাড়াই তারা অত্যন্ত পাষাণ ও নির্দয় হয়ে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করত অথবা জীবন্ত গোরস্থ করত। এতে তারা অত্যন্ত পাষণ্ড হৃদয়ের পরিচয় দিত তাদের মধ্যে কোনো দয়া-মায়া বলতে কিছুই ছিল না। এহেন গর্হিত কাজটি করতে তাদের বিবেক তাদের কোনো বাধা দিত না।

আবার কখনো তার পিতা দেশের বাইরে বা কোনো কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে হত্যা করতে পারত না। ফলে সে যখন বাড়িতে আসত, তখন তাকে হত্যা করত। এতে দেখা যেত সে বড় হয়ে গেছে এবং সব কিছু বুঝে; তারপরও তারা তাকে হত্যা করত। বড় হয়ে যাওয়া ও সব কিছু বুঝতে পারা ইত্যাদি কোনো কিছুই এ সব পাষণ্ডদের এ অমানবিক কাজ থেকে বিরত রাখতে পারত না।

এ বিষয়ে পরবর্তীতে তাদের অনেকেই নিজদের জীবনের একাধিক হৃদয়বিদারক ঘটনার একাধিক বর্ণনা দিয়েছেন।

আবার তাদের অনেকে এমন আছে, যারা তাদের কন্যা সন্তানদের পাহাড়, ঘরের চাঁদ অথবা অন্য কোনো উঁচু স্থান থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করত।

আল্লাহ তা‘আলা এ জঘন্যতম ঘৃণিত কাজটি সম্পর্কে কুরআনে করীমেও আলোচনা করেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ . بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت﴾

“আর যখন জীবন্ত গোরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? [সূরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ৮-৯]

- আরবের যারা খুব গরীব ও অসহায় গোত্র ছিল, তারা তাদের কন্যা সন্তানদের দরিদ্রতা, অভাব ও তাদের জন্য ব্যয় করার মত কিছু না থাকার কারণে হত্যা করত। আল্লাহ তাদের এসব কারণে হত্যা করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করে বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ٣١﴾ [الاسراء: ٣١]

“অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমরাই তাদেরকে রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩১]

জাহেলিয়্যাতের যুগে আরবদের মধ্যে আরও একটি ব্যতিক্রম নিয়ম ছিল, আরবের কতক সরদার ও সম্ভ্রান্ত লোক কন্যা সন্তানদের ক্রয় করে নিত।এ বিষয়ে সা-সা ইবন নাহিয়া নামে এক ভদ্র লোক বলেন, ইসলামের আগমনের পূর্বে তিনশত জীবন্ত-প্রোথিত (যাদের হত্যা করা হত) কন্যা সন্তানকে আমি মুক্ত করছি।

আরবদের মধ্যে আরেকটি প্রথা ছিল, তারা এ বলে মান্নত করত; যদি তাদের দশটি সন্তান হয় তাহলে তারা একটিকে জবেহ করবে। আব্দুল মুত্তালিব নিজেও এ ধরণের মান্নত করেছিল।

আবার তাদের কতক লোক করত, ফিরিশতারা হলো আল্লাহর কন্যা অথচ তারা যা বলে আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়ে অধিক হকদার।

আর যিনা-ব্যভিচার আরবদের মধ্যে কোনো দূষণীয় বিষয় ছিল না। যিনা-ব্যভিচার করাকে আরবের স্বাধীন মহিলারা তাদের উন্নতি ও অহংকারের কারণ বলে বিবেচনা করত। তবে তারা তা প্রকাশ করা এবং এ গুণে তাদের সম্বোধন করাকে অপছন্দ করত! (একে তারা তাদের জন্য অপমান হিসেবে আখ্যায়িত করত) তাদের মধ্যে যেনা-ব্যভিচার ছিল অত্যন্ত সংগোপনে, কেউ তা জানতে পারত না।

ইসলাম আসার পর ইসলাম পবিত্রা নারীদের প্রশংসা করে এবং যাবতীয় অপকর্ম ও সব ধরণের যেনা-ব্যভিচার হতে নারীদের বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়। নারীদের পবিত্রতা সংরক্ষণ ও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের যাবতীয় উপায় উপকরণ অবলম্বনের নির্দেশ দেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥﴾ [المائدة: ٥]

“আজ তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো সব ভালো বস্তু এবং যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তাদের খাবার তোমাদের জন্য বৈধ এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্য বৈধ। আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীদের সাথে তোমাদের বিবাহ বৈধ। যখন তোমরা তাদেরকে মোহর দেবে, বিবাহকারী হিসেবে, প্রকাশ্য ব্যভিচারকারী বা গোপন গ্রহণকারী হিসেবে নয়। আর যে ঈমানের সাথে কুফুরী করবে, অবশ্যই তার আমল বরবাদ

হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫]

তাদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং মধ্যম শ্রেণির লোক তাদের মধ্যে নারীদের সাথে বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, যার আলোচনা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা করেছেন, তিনি বলেন,

«أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته ، فيصدقها ثم ينكحها . ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع .

ونكاح أخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة ، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فأذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع

حملها ، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل .

ونكاح رابع : يجتمع الناس كثيرا، فيدخلون على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن أراد دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرو، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم».

“জাহেলিয়্যাতের যুগে বিবাহ ছিল চার প্রকার।

এক- বর্তমানে মানুষ যেভাবে বিবাহ করে- কোনো ব্যক্তি কারো অভিভাবকের নিকট তার অভিভাকত্বের অধীন কোনো মেয়েকে অথবা সে অভিভাবকের নিকট তার

মেয়ের জন্য বিবাহের প্রস্তাব করত। তারপর সে রাজি হলে, তাকে মোহরানা দিয়ে বিবাহ করবে।

দুই- স্বামী তার স্ত্রীকে বলত, তুমি তোমার অপবিত্রতা হতে পবিত্র হলে অমুকের নিকট গিয়ে, তার কাছ থেকে তুমি উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর। তারপর তার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখত এবং যতদিন পর্যন্ত ঐ লোক যার সাথে সে যৌনাচারে লিপ্ত হয়েছিল, তার থেকে গর্ভধারণ না করা পর্যন্ত সে তাকে স্পর্শ করত না। আর যখন সে গর্ভধারণ করত তখন চাইলে সে তার সাথে সংসার করত অথবা ইচ্ছা করলে সে নাও করতে পারত। আর তাদের এ ধরণের অনৈতিক কাজ করার উদ্দেশ্য হলো, যাতে তাদের গর্ভে যে সন্তান আসবে তা মোটা তাজা ও সুঠাম দেহের অধিকারী হয়। এ বিবাহকে জাহেলিয়্যাতের যুগে নিকাহে ইস্তেবজা বলা হত।

তিন- দশজনের চেয়ে কম সংখ্যক লোক একত্র হত, তারা সকলেই পালাক্রমে একজন মহিলার সাথে সঙ্গম

করত। সে তাদের থেকে গর্ভধারণ করার পর যখন সন্তান প্রসব করত এবং কয়েক দিন অতিবাহিত হত, তখন সে প্রতিটি লোকের নিকট তার নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর পাঠাতো। নিয়ম হলো, সে যাদের নিকট সংবাদ পাঠাতো কেউ তা অস্বীকার করতে পারতো না। ফলে তারা সকলে তার সামনে একত্র হত। তখন সে তাদের বলত তোমরা অবশ্যই তোমাদের বিষয়ে অবগত আছ। আমি এখন সন্তান প্রসব করেছি এর দায়িত্ব তোমাদের যে কোনো একজনকে নিতে হবে। তারপর সে যাকে পছন্দ করত তার নাম ধরে তাকে বলত এটি তোমার সন্তান। এভাবেই সে তার সন্তানকে তাদের একজনের সাথে সম্পৃক্ত করে দিত। লোকটি তাকে কোনোভাবেই নিষেধ করতে পারত না।

চার- অনেক মানুষ কোনো একই মহিলার সাথে যৌন কর্মে মিলিত হত। তার অভ্যাস হলো, যেই তার নিকট খারাব উদ্দেশ্য আসতো, সে কাউকে নিষেধ করত না

এবং বাধা দিত না। এ ধরণের মহিলারা হলো, ব্যভিচারী মহিলা। তারা বাড়ির দরজায় নিদর্শন স্থাপন করত, যাতে মানুষ বুঝতে পারত যে, এখানে কোনো যৌনাচারী মহিলা আছে। যে কেউ ইচ্ছা করে সে এখানে প্রবেশ করতে পারে। তারপর যখন তারা গর্ভবতী হত এবং সন্তান প্রসব করত, তারা সবাই তার নিকট একত্র হত এবং একজন গণককে ডাকা হত। সে যাকে ভালো মনে করত, তার সাথে সন্তানটিকে সম্পৃক্ত করে দিত এবং তাকে তার ছেলে বলে আখ্যায়িত করা হত। নিয়ম হলো গণক যাকে পছন্দ করবে সে তাকে অস্বীকার করতে পারত না।

এভাবেই চলতে ছিল আরবদের সামাজিক অবস্থা ও তাদের নারীদের করুণ পরিণতি। তারপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যের বাণী নিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলো, রাসূল জাহেলিয়্যাতের যুগের

সব বিবাহ প্রথাকে বাদ দিয়ে দিলেন একমাত্র বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ ছাড়া।”[1]

জাহেলিয়্যাতের যুগে কোনো কোনো আরবরা দাসীদের মাঝে অর্থ উপার্জনের জন্য বা তাদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যভিচারকে উৎসাহিত করত। ইসলামের আগমনের পর আল্লাহ তা‘আলা দাসীদের ব্যভিচারে বাধ্য করতে নিষেধ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٣﴾ [النور: ٣٣]

---

[1] সহীহ বুখারী বুখারী, হাদীস নং ৫১২৭

“আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাব-মুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায় তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দাও। তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের কামনায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৩]

এভাবেই জাহেলিয়্যাতের যুগে নারীদের প্রতি বৈষম্য ও তাদের ভোগের পণ্যে পরিণত করা হত। তাদের সমাজের বোঝা মনে করা হত। মানুষ হিসেবে সমাজে

তাদের কোনো মূল্যায়ন ছিল না। যুলুম নির্যাতন ছিল তাদের নিত্যদিনের সাথী। নারী বলে জন্ম গ্রহণ করাই ছিল তাদের একমাত্র অপরাধ। প্রতিনিয়তই তারা নির্যাতিত হত পুরুষদের মাধ্যমে।

তারপর যখন ইসলামের আগমন ঘটল, ইসলামই নারীদের মর্যাদার আসনে সমাসীন করলেন। তাদের সম্মান ও আত্ম-মর্যাদাবোধ তাদের ফিরিয়ে দিলেন। ইসলাম নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সহ তাদের থেকে যাবতীয় যুলুম নির্যাতন প্রতিহত করল। তাদের প্রতি পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কী তা পালনে ইসলাম পুরুষদের বাধ্য করল।

ইসলাম ছোট বেলায় কন্যা সন্তান হিসেবে, কৈশোরে বোন হিসেবে, যুবতী হলে স্ত্রী হিসেবে এবং বার্ধক্যে পৌঁছলে মা হিসেবে নারীদের যথার্থ মূল্যায়ন করল এবং তাদের উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করল। বর্তমানে অনেকগুলো প্রচার মাধ্যম, সাহিত্যিক ও লেখকগণ

নারীদের ছোট বেলা থেকে নিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছা পর্যন্ত ইসলাম যে অধিকার দিয়েছেন তা সম্পর্কে তাদের নূন্যতম কোনো জ্ঞান না থাকার কারণে তারা ইসলাম বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য করে থাকে। অথচ ইসলাম নারীদের যে সম্মান ও অধিকার দিয়েছে, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ। এ বিষয়ে কিয়দংশ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. ইসলাম নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং মানুষ হিসেবে তাদের সম্মান দিয়েছে। ইয়াহূদীরা মনে করে নারীরা অত্যন্ত খারাপ আত্মার অধিকারী ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির। কারণ, নারীর কারণেই আদম 'আলাইহিস সালাম ধোঁকায় পড়ল এবং নারীই জান্নাত হতে বের ও বিতাড়িত হওয়ার কারণ হলো, ইসলাম এ ধারনার সমর্থন করে না।

জাহেলিয়্যাতের যুগের আরবরা গোমরাহী ও অজ্ঞতার উপর এতই মগ্ন ছিল যার কারণে তারা নারীদের অস্তিত্বই

মেনে নিতে রাজি হতো না বরং নারীদের কথা শুনলেই তাদের চেহারা কালো হয়ে যেত। রাগে, ক্ষোভে ও লজ্জায় তাদের মাটিতে মিশে যাওয়ার উপক্রম হত। আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলল:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝٥٩﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩]

"আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সে দুঃখে সে কাওমের থেকে আত্মগোপন করে। অপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, তারা যা ফয়সালা করে, তা কতই না মন্দ!" [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৫৮-৫৯]

অথচ আল্লাহ তা‘আলা নারী ও পুরুষদের সম্মানের দিক দিয়ে তাদের উভয়ের সমমর্যাদার অধিকারী করেন। আল্লাহর মাখলুক হিসেবে তাদের উভয়ের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা‘আলা তাদের দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا ٧٠﴾ [الاسراء: ٧٠]

“আর আমরা তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিয্ক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭০]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা নারী পুরুষ সবাই যে মানুষেরই অন্তর্ভুক্ত তা তিনি নিশ্চিত করেন। নারী পুরুষ

সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের আল্লাহ তা'আলা এক আত্মা থেকেই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾

[النساء: ١]

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১]

সুতরাং প্রতিটি মুসলিম নারী এ কথা বিশ্বাস রাখবে যে, সে একজন নারী সেও একজন মানুষ। নারী হওয়াতে সে কখনোই কোনো প্রকার হীনমন্যতায় ভুগবে না। কখনোই ভাববে না যে, তার সৃষ্টি ছিল অনর্থক, তার দ্বারা জাতির কোনো উপকার হয় না এবং সে জ্ঞান বুদ্ধিতে দুর্বল। কারণ, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের জন্য যা করা উপযোগী সে বিষয় সম্পাদন করার জন্য তাদেরকে বিশেষ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়েছে।

যেমনিভাবে যিনি একজন পুরুষ তাকে তার জন্য প্রযোজ্য ও উপযুক্ত বিষয়ে যোগ্য করে সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানিত করেছেন, অনুরূপভাবে একজন নারীকেও তার পাওনা উপযুক্ত সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার আল্লাহ দিয়েছেন। একজন নারী যদি কোনো নেক আমল করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে একজন পুরুষের সমপরিমাণ সাওয়াব ও বিনিময় দিয়ে থাকেন। নারীকে

নারী হওয়ার কারণে তার ছাওয়াব ও মর্যাদায় কোনো-ভাবেই কম দেওয়া হয় না। এদিক থেকে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদার অধিকারী করা হয়েছে। নারী হওয়ার কারণে তার সাওয়াব ও বিনিময়ের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ ও কম করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾ [النحل: ٩٧]

"যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমরা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।" [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৯৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٧٢﴾ [التوبة: ٧٢]

“আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই মহা-সফলতা।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুমিন মহিলার মহান প্রতিদানের বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে বলেন,

«إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها؛ دخلت من أي أبواب الجنة شاءت»

“যখন কোনো নারী দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযান মাসের সাওম পালন করে, স্বীয় লজ্জা-স্থানের হিফাযত করে এবং সে তার স্বামীর অবাধ্য না হয়, সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা করে প্রবেশ করতে পারবে।”

এর অর্থ হচ্ছে, একজন মুমিন নারীর জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথ একজন পুরুষের তুলনায় অধিক সহজ ও জান্নাতের দরজাসমূহ তাদের একেবারেই সন্নিকটে।

অনুরূপভাবে তাদের জন্য শাস্তি প্রয়োগের বিধানও পুরুষদের মতই অর্থাৎ তাদের প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্য করা হবে না। যেমন, চুরি, যিনা-ব্যভিচার, মদ্যপান ও অপবাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের শাস্তিও পুরুষের শাস্তিরই অনুরূপ। মহিলা হওয়ার কারণে তাদের বেশি শাস্তি দেওয়া হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»

“আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করে তাহলে আমি তার হাত কেটে ফেলব।”[2]

নারীরা অধিকারের ক্ষেত্রে, পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বিষয়ে পুরুষের মতোই সমান অধিকারের অধিকারী। তাদের অধিকারের মধ্যে কোনো ঘাটতি হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١﴾ [التوبة: ٧١]

“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত

[2] সহীহ বুখারী: কিতাবুল আহাদীছিল আম্বিয়া।

প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১]

তবে নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান-তো আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টিগতভাবেই করেছেন। তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। তাদের উভয়ের মধ্যে একেবারে পুরোপুরি সমানাধিকারের বিষয়টি ইসলাম ইনসাফের পরিপন্থী বলে বিবেচনা করে। নারী ও পুরুষদের আল্লাহ তা‘আলা বিশেষ ও আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদের রয়েছে জন্মগতভাবে আলাদা আলাদা স্বভাব ও প্রকৃতি। সুতরাং তাদের উভয়কে সমানাধিকার দেওয়া কোনো ইনসাফ বা বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। যদি তাদের সমান অধিকার দেওয়া হত এবং একে অপরের শূন্যতা পূরণ করতে পারতো, তাহলে মানব জীবনের ভারসাম্য

বিনষ্ট হয়ে যেতো এবং মানুষ এক অনিশ্চিত জীবনের সম্মুখীন হতো।

বর্তমান ও অতীতের সামাজিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্ঞানীদের স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে, নারীদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মাতৃত্বের অভাব পূরণ করা, পরিবার-পরিজনের খেদমত ও সন্তানের লালন-পালনের জন্য। আর পুরুষের সৃষ্টির হিকমত হলো, তারা বাইরের কাজগুলো সমাধান করবে, রিযিক উপার্জনের ব্যবস্থা করবে এবং তারা তাদের পরিবারের ভরণ পোষণের দায়িত্ব ও ব্যয়ভার বহন করবে।

বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ড. আল কাসীস কিরীল নারী ও পুরুষের গঠন প্রকৃতির পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

“নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য শুধু তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৈহিক কাঠামো, যৌনাঙ্গ, গর্ভধারণ ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ নয় এবং শুধু উভয়ের শিক্ষার মাধ্যম ভিন্ন হওয়াতেও সীমাবদ্ধ নয়!

বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক, সত্বাগত, দৈহিক, জন্মগত ও প্রকৃতিগত। মনে রাখতে হবে, নারীরা পুরুষ হতে তাদের দেহাভ্যন্তরের অনুপ্রবেশ-কৃত সাদা পানি যা ভিন্ন ও আলাদা হয়ে থাকে, সে সব রাসায়নিক ধাতুতেও তারা উভয় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। যারা কোমল প্রকৃতি ও নরম স্বভাবের নারীদেরকে পুরুষের সমান অধিকারের জন্য শ্লোগান দেয়, তার মূলতঃ কোমলমতি নারী ও পুরুষের মধ্যে এসব মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণাই রাখে না। তারা মূলতঃ প্রকৃতিরই বিরোধিতা করে। মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা না থাকার কারণে তারা দাবী করে যে, তাদের উভয়ের অধিকার সমান হতে হবে, তাদের উভয়ের মাঝে শিক্ষা-দীক্ষা, দায়-দায়িত্ব ও কাজ-কর্মে কোনো পার্থক্য বা বৈষম্য থাকতে পারবে না। বাস্তবে নারীরা পুরুষ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, তাদের প্রকৃতি ও জন্মগত দিক দিয়ে তাদের মধ্যে অনেক অমিল রয়েছে। বরং, আরও আগে বাড়িয়ে বলা যায়, তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও

ভিন্নতা জাগতিক শৃঙ্খলার একটি চিরন্তন বিধান ও সৃষ্টির রহস্য।

ঊর্ধ্ব জগতের নিয়মের মতই মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গের যাবতীয় কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত নিয়মনীতি আছে। ফলে শুধুমাত্র মানবজাতির নিরাপত্তা বিধানের অজুহাতে জাগতিক নিয়মনীতিতে কোনো প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার অধিকার কেউ রাখে না। আমাদের করণীয় হলো, আইন যেভাবে আছে তা সেভাবেই পালন করা ও মানব স্বভাবের পরিপন্থী কোনো কাজ করার চেষ্টা হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। নারীদের কর্তব্য হলো জন্মগতভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের যে যোগ্যতা ও দায়-দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা যথাযথ পালনের চেষ্টা করা। তারা নারী হয়ে পুরুষদের অন্ধানুকরণ হতে বিরত থাকা এবং তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে তাদের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ না করা। নারী যাদের কর্তব্য হলো, ঘরের যাবতীয় বিষয়গুলো ও

পারিবারিক কার্যক্রম দেখা শোনা করা, কিন্তু তারা তা না করে, যদি মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান অধিকারের ব্যানারে পুরুষের মতই সমান দায়িত্ব পালনের জন্য নেমে পড়ে তবে কি তা ইনসাফ হতে পারে? যারা এ সব করে তারা প্রকৃতপক্ষে নারীদের প্রতি সুবিচার করল নাকি তাদের উপর অত্যাচার করল? তার বিবেচনার দায়িত্ব আপনাদেরই।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবি (মানব জাতির সমসাময়িক ইতিহাসের শিক্ষণীয় বিষয়) শিরোনামে একটি লিখনিতে উল্লেখ করেন, জাগতিক ও বস্তুবাদের উপকরণের মাধ্যমে আমাদের যাবতীয় সমস্যাগুলো সমাধানের সব ধরণের প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের খণ্ড-বিখণ্ড সব উদ্যোগই ব্যর্থ হয়েছে..!! আমরা দাবী করে থাকি যে, আমরা প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো ও কর্মঠ জনশক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়ানোর জন্য অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমরা আমাদের পরিকল্পনার ফলাফল

হিসেবে যে অদ্ভুত উন্নতি লাভ করেছি তা হলো, আমরা বর্তমানে নারীদের উপর তার ক্ষমতার ঊর্ধ্বে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছি। অথচ ইতোপূর্বে এ ধরণের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়াকে আমরা কখনোই প্রত্যক্ষ করিনি। ফলে আমেরিকাতে নারীরা তাদের কর্তব্য অনুযায়ী ঘরের কাজগুলো সমাধান করার কোনো সুযোগ পাচ্ছে না। তাকে ঘরের বাইরেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে হচ্ছে।

বর্তমানে নারীদের দু ধরণের কাজ: এক হলো, তারা বিভিন্ন ধরণের মিল, ফ্যাক্টরি ও অফিস আদালতে কর্মরত। দ্বিতীয়ত, তারা তাদের ঘর ও পারিবারিক কাজে কর্মরত। উল্লিখিত উভয় ধরণের কাজই পশ্চিমা নারীরা করে; কিন্তু তারা বাস্তবে তাদের অতিরিক্ত কাজের পিছনে কোনো প্রকার কল্যাণ দেখতে পায় না। কারণ, ইতিহাস প্রমাণ করে, যে যুগে নারীরা তাদের ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছে সে যুগই পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে অধঃপতিত ও নিকৃষ্ট যুগ।

এ ছাড়াও পুরুষরা উদ্যমী ও তৎপর হয়ে কর্মক্ষেত্রে যোগদানের মাধ্যমে আশানুরূপ সফলতা ও উন্নতি লাভের জন্য গৃহাভ্যন্তরে যে ধরণের সেবা, যত্ন ও অধিকার ভোগ করা দরকার তা কোথায়? বাচ্চাদের গড়ে উঠার জন্য মায়ের আদর, যত্ন ও লালন পালনের ক্ষেত্রে তার যে কর্তব্য ও দায়িত্ব যেমন, বাচ্চাদের দুধ পান করানো, আদর যত্ন ও সহানুভূতি দিয়ে খাওয়ানো ইত্যাদি তা কিভাবে আদায় হবে?

সামোবিল সামায়েলস (যিনি একজন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ছিলেন) তিনি বলেন, নারীদের জন্য বিভিন্ন কলকারখানা ইত্যাদিতে কাজ করার যে নিয়ম রাখা হয়েছে, এতে যদিও অর্থনৈতিকভাবে তারা স্বাবলম্বী হচ্ছে, তবে এর ফলে পারিবারিক জীবনের মৌলিক ভিত্তি ধ্বংসের মুখে পড়ছে। কারণ, নারীদের জন্য ঘরের বাইরে কাজ করাটা পারিবারিক জীবনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এতে পরিবারের ভিত্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, সামাজিক বন্ধন

তছনছ হয়ে পড়ে, স্ত্রী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং সন্তানরা তাদের পরিবার পরিজন হতে দূরে সরে যায়। নারীদের ঘরের বাইরে কাজ করতে দেওয়ার দ্বারা তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ছাড়া আর কোনো বিশেষ উপকার হয় নি। কারণ, একজন নারীর প্রকৃত দায়িত্ব হলো, সে তার পরিবারের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো দেখা শোনা করবে। যেমন, ঘর গোছানো, সন্তানদের লালন-পালন, স্বামীর খেদমত ইত্যাদি। নারীরা মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জীবণাপকরণগুলোকে সুন্দরভাবে সামাল দেবে এবং ঘরের প্রয়োজনগুলো সুন্দরভাবে পরিচালনা করবে...কিন্তু তা না করে মেয়েরা যখন ঘরের বাইরে কাজ করতে যায়, তখন তারা এ সব কাজকর্ম ও ঘরের আভ্যন্তরীণ যাবতীয় দায়িত্বগুলো পালন করতে পারে না। ফলে দেখা যায়, ঘর আর ঘর থাকে না, ঘর একটি কারাগার ও অশান্তির কারখানায় পরিণত হয়, ঘরের মধ্যে সব সময় ঝগড়া বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকে। সন্তানরা কোনো প্রকার তালীম তারবিয়ত ছাড়া লালিত-

পালিত হতে থাকে। কেমন যেন তাদের একটি অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল মুহাব্বত থাকে না, স্ত্রী স্বামীর বন্ধন ও আন্তরিক ভালোবাসা হতে বের হয়ে পড়ে। তারা কলকারখানা ও কর্ম ক্ষেত্রে পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করতে থাকে। এর প্রভাবে অধিকাংশই এমন হয়, মানসিক চিন্তাধারা নৈতিক-চরিত্র ও পারস্পরিক মুহাব্বাত -যার উপর পরিবারের ভিত্তি- তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়ে যায়।

মুসলিম মনীষীদের জন্য কর্তব্য হলো, মুসলিম সমাজের জন্য ইসলামের নীতি আদর্শ ও বিধান অনুযায়ী এমন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যা সমাজের সর্ব প্রকার সমস্যা সমাধান ও মানব জীবনের সব ধরণের অভাব দূর করতে সক্ষম হয়। আর তারা যেন এমন পরিকল্পনা পেশ করে, যা সফলকাম জীবনের জন্য যা যা দরকার তার প্রতিটি বিষয়ের অভাব পূরণের প্রতি যত্নবান হয়। এমন এক নীতি মালা তৈরি করতে হবে, যাতে যারা নারী

স্বাধীনতার ভুয়া শ্লোগান ও ওযুহাত দাঁড় করিয়ে এ উম্মতের সমাধি কামনা করে, তারা যেন তাদের মিশন বাস্তবায়নে মানবতার ওপর কোনো প্রকার প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে। এমন এক পরিকল্পনা পেশ করতে হবে, যা দেখে মানুষ বুঝতে পারে যে, এ উম্মতই মানবজাতির নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করার অধিক যোগ্য জাতি এবং এরাই হলো মানবতার মুক্তিদূত ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। যদি দেশের বিভিন্ন কার্যক্রম ও শ্রেণি পেশায় নারীর অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে, তবে তাও যেন হয় তাদের আসল মূলনীতির আলোকে। অর্থাৎ ঘরে থাকাকে ঠিক রেখেই, রাস্তায় নেমে বা বাড়ীর আঙ্গিনার বাইরে নয়। কারণ, সে তো একজন মুসলিম নারী অন্যান্য নারীদের মতো উদাসীন নয়, তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলো তাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তিনি একজন ব্যবসায়ী নারী ছিলেন। তিনি ঘরে বসেই একজন বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে তার যাবতীয় ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তার ব্যবসা তাকে ঘরের বাইরে যেতে বাধ্য করে নি এবং তার ঘরে কোনো শূন্যতাও বিরাজ করে নি, বরং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তম সহযোগী ছিলেন, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে এবং দীনি দায়িত্ব আঞ্জাম ও পরিচালনার জন্য তার ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর খালাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাগানের কাজ করার অনুমতি দিলে, তিনি তার প্রয়োজনীয় উপার্জন ও পরিবারের লোকদের খাদ্য যোগান দেওয়ার জন্য তার নিজস্ব মালিকানাধীন বাগানের অভ্যন্তরে কাজ করতেন। তাকে পুরুষদের সাথে অবাধ মিলে মিশে কাজ করতে হয় নি। আজ আমরা নারীদের জন্য যে পরিকল্পনা পেশ করি তা

এ সব বাস্তবতা হতে অনেক দূরে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপলব্ধি করার তাওফীক দিন।

নারীরা কেন ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ পাবে না?

নারীদের জন্য আলাদা কর্মস্থল তৈরি করতে হবে যেখানে নারীদের সাথে পুরুষের সংমিশ্রণ থাকবে না। একজন নারী ইচ্ছা করলে সমাজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সুতরাং তাকে কাজে লাগাতে হলে, তার জন্য উপযোগী কর্মক্ষেত্রে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা সমাজের উপকার করতে পারে এবং দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করতে পারে। তারা যেখানে কাজ করবে তা যেন হয় পুরুষদের থেকে দূরে এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর তাদের কাজের সময় যেন হয় তাদের জন্য উপযোগী; যাতে তারা তাদের পরিবারের যাবতীয় কাজগুলো সমাধান করতে যথেষ্ট সুযোগ পায়। সন্তান যেন মাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়। আর স্বামী যেন স্ত্রীর অভাব অনুভব না করে।

অনুরূপভাবে জরুরি হলো, নারীদের ঈমান, আক্বীদা, আমল-আখলাক, শিক্ষা-দীক্ষা, শরীর চর্চা ইত্যাদি

বিষয়গুলোর উন্নতির জন্য জোর চেষ্টা চালানো। যাতে তারা যুগের চাহিদা অনুযায়ী সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে এবং লাভ করতে পারে উন্নত জীবন। তারাও যেন বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে হতে পারে যোগ্য থেকে যোগ্যতর। আর তা যেন হয়, সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনার আলোকে, যা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং যাবতীয় সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান দেবে। আর তা যেন হয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল।

২. ইসলাম নারীদের বিশ্বাস ও চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছেন। নারীদের একান্ত কোনো বিষয় ছাড়া ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো ব্যবধান ও বৈষম্য তৈরি করেনি, বরং ইসলাম নারীদেরকে পুরুষের মতই সমানভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের ৯১ টি

স্থানে হে ঈমানদারগণ বলে সম্বোধন করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা হে মানবজাতি বলে ১৮ টি স্থানে সম্বোধন করেছে। এ সব সম্বোধনে আল্লাহ তা'আলা নারী পুরুষ সবাইকে সমানভাবেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ছাড়াও কুরআন ও হাদিসে সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা এবং আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় জানার আহ্বান জানানো হয়েছে। তাতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো ব্যবধান করা হয় নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَمَا تُغۡنِي ٱلۡأٓيَٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوۡمٖ لَّا يُؤۡمِنُونَ ١٠١﴾ [يونس : ١٠١]

"বল, আসমানসমূহ ও জমিনে কী আছে তা তাকিয়ে দেখ। আর নিদর্শনসমূহ ও সতর্ককারীগণ এমন কওমের কাজে আসে না, যারা ঈমান আনে না।" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০১]

অনুরূপভাবে নারীরা তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পুরুষদের মতোই স্বাধীন। তারা তাদের ইচ্ছা মতোই ঈমান আনবে বা বিরত থাকবে। তাদের কেউ কোনো দীন কবুল করার ক্ষেত্রে বাধ্য করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ.........﴾ [البقرة: ٢٥٦]

"দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬]

আব্দুর রহমান আস-সা'দী রহ. বলেন, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মানব স্বভাবের সাথে তার সখ্যতা ও সম্পর্ক গভীর হওয়াতে ইসলাম গ্রহণের জন্য কাউকে বাধ্য করার প্রয়োজন পড়ে না। বাধ্য করার প্রয়োজন তখন হয়, যখন মানবাত্মা তা হতে পলায়ন করে, সত্য ও বাস্তবতা বিবর্জিত হয় অথবা যখন দলীল প্রমাণ ও তার নিদর্শনসমূহ অস্পষ্ট থাকে। অন্যথায় কারও নিকট

এ দীনের দাওয়াত পৌঁছার পরও সে তা কবুল করবে না তা হতেই পারে না। যদি কেউ করেই থাকে তবে তার হটকারিতা ও অহমিকার কারণেই হয়ে থাকে। কারণ, ইসলামের আগমনের ফলে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে আর অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। সুতরাং, কারো জন্য এদিক সেদিক যাওয়ার অবকাশ চিরতরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তার প্রত্যাখ্যান করাটা অগ্রহণযোগ্য। তাকেই প্রত্যাখ্যান করা হবে।

এ কারণেই দেখা যেত জাহেলিয়্যাতের যুগে নারীরাও স্বাধীনভাবে ইসলাম গ্রহণ করত অথচ তাদের পরিবারের অন্য লোকেরা সবাই তখনো মুশরিক। তাদের অন্যতম হলেন, ফাতেমা বিনতুল খাত্তাব- তিনি তার ভাই উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, বরং তার ইসলাম উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়।

অনুরূপভাবে উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবন আবি মু'য়াইত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তার পরিবারের অন্যরা সবাই ছিল মুশরিক। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা একজন মুসলিমের জন্য আহলে কিতাবী কোনো নারীকে বিবাহ হালাল করেছেন। কিতাবী কোনো নারী কোনো মুসলিমের সাথে বিবাহ হলে তাকে তার দীন ধর্ম ও বিশ্বাস পরিবর্তন করতে বাধ্য করে না ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥﴾ [المائدة: ٥]

"আজ তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো সব ভালো বস্তু এবং যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তাদের খাবার

তোমাদের জন্য বৈধ এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্য বৈধ। আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীদের সাথে তোমাদের বিবাহ বৈধ। যখন তোমরা তাদেরকে মোহর দেবে, বিবাহকারী হিসেবে, প্রকাশ্য ব্যভিচারকারী বা গোপন-পত্নী গ্রহণকারী হিসেবে নয়। আর যে ঈমানের সাথে কুফরি করবে, অবশ্যই তার আমল বরবাদ হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতি-গ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫]

৩. ইসলাম একজন মহিলার জীবনের শুরু থেকে নিয়ে বৃদ্ধা হওয়া পর্যন্ত, সব অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে। ইসলাম একজন নারীকে বাল্যকালে কন্যা হিসেবে, প্রাপ্তবয়স্কা হলে স্ত্রী হিসেবে, ও বৃদ্ধ বয়সে মা হিসেবে বিভিন্নভাবে মর্যাদা দিয়েছে। কারণ, ইসলাম অধিকারের দিক দিয়ে ছেলে ও মেয়ে হওয়ার দিক দিয়ে কোনো প্রকার পার্থক্য করে নি।

একজন ছেলের জন্য যে অধিকার একজন মেয়ের জন্যও ঠিক একই অধিকার। উভয়ের মাঝে কোনো প্রকার বৈষম্য ও ব্যবধান করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা পিতাদের উপর তাদের সন্তানদের লালন পালন ভরণ পোষণ শিক্ষা দীক্ষা ও আদব আখলাক শিখানোকে কর্তব্য করে দিয়েছেন।

বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলাম মেয়েদেরকে ছেলেদের তুলনায় আরও অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। কারণ, যে ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানদের লালন-পালন করে এবং তাকে আদব আখলাক শিক্ষা দেয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة»

"যার তিনটি কন্যা সন্তান হবে এবং সে তাদের লালন-পালনে ধৈর্য ধারণ করবে, তাদের খাদ্য, পানীয় ও

বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক হবে।”[3]

ইসলাম তাদেরকে তাদের জীবন সঙ্গীকে বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছে, যাতে তারা তাদের পছন্দনীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারে এবং যদি স্বামী তার অপছন্দ হয়, তাকে সে প্রত্যাখ্যানও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাদের কোনো প্রকার বাধ্য করার অবকাশ নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الأيم أحق بنفسها من وليها . والبكر تستأذن في نفسها ... وإذنها صماتها ؟ قال : نعم».

“একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী তার নিজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে তার অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার। একজন কুমারী নারীর নিকট সরাসরি অনুমতি চাওয়া

---

[3] ইবন মাজাহ, কিতাবুল আদব। আল্লামা আলবানী হাদীসটি সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তার চুপ থাকা কি অনুমতি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[4]

ইসলাম তাদের সম্মান দিয়েছেন তাদের জন্য ঔসব হক্ককে ফরয করার মাধ্যমে যা তাদের কর্তব্য রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

"আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের ওপর (পুরুষদের) অধিকার। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের উপর মর্যাদা এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২৮]

আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য মাহরের বিধান চালু করেছেন এবং স্বামীর ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীদের

---

[4] সহীহ মুসলিম (কিতাবুন নিকাহ), হাদীস নং ২৫৪৫।

ভরণ-পোষণকে ফরয করেছেন এবং স্বামীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি নারীদের থেকে এমন কোনো আচরণ প্রকাশ পায়, যা তোমাদের কষ্টের কারণ হয়, তাহলে তোমাদের অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩﴾ [النساء : ١٩]

"হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিশ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেওয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা

কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ হলো, আল্লাহ তা'আলা স্বামীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং তাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট না দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«استوصوا بالنساء خيراً»

"তোমরা তোমাদের নারীদের প্রতি কল্যাণকামী হও। তাদের সাথে সৎ আচরণ কর।"[5]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«اللَّهُمَّ إني أُحرج حق الضعيفين : اليتيم، والمرأة»

[5] সহীগহ মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ।

“হে আল্লাহ, আমি দু’ ধরণের দুর্বল শ্রেণির লোকের অধিকারের বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করছি: ইয়াতীম ও নারী।”[6]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বামীদের ওপর স্ত্রীদের অধিকার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন,

«أن يطعمها إذا طعم ، ويكسوها إذا اكتسى ،ولا يضرب الوجه، ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت»

“তোমাদের কেউ যখন খেতে পায় তখন তার স্ত্রীকে খেতে দেবে, আর যখন সে পরিধান করতে সক্ষম হয়, তখন স্ত্রীকেও পরিধান করাবে, আর তার তাকে চেহারায় প্রহার করবে না, বিকৃতি করবে না বা তার কাজ ও

[6] ইবন মাজাহ, কিতাবুল আদব। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন

কথাকে কুৎসিত বলে গণ্য করবে না এবং ঘর ছাড়া অন্য কোথাও একাকী ছাড়বে না।”[7]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«خياركم خياركم لنسائهم»

তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম।”[8]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«لقد طاف بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم!!»

“রাসূলের পরিবারে অনেকগুলো নারী একত্র হলো, তারা সবাই তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে মারার অভিযোগ করল,

---

[7] ইবনে মাজাহ কিতাবুন নিকাহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[8] আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন

আর আল্লাহর শপথ! তোমরা তাদেরকে তোমাদের মধ্যকার উত্তম লোক হিসেবে পাবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»

“যার স্ত্রী দুজন থাকে এবং লোকটি তাদের একজনের দিকে অধিক ঝুঁকে পড়ে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে এক পাশ ঝুঁকে থাকা অবস্থায়।”[9]

একজন নারী যখন মা হয়, তখন সে ঘরের একজন অভিভাবক ও সরদার হয়ে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতকে তাদের পায়ের তলে রেখেছেন এবং সন্তানদের দায়িত্ব দিয়েছেন, তারা যেন তাদের মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে, তাদের আদেশ নিষেধের অনুকরণ করে, তাদের জন্য দো‘আ করে এবং

[9] আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন

প্রয়োজনের সময় তাদের জন্য ব্যয় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًاۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًاۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًاۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥﴾ [الاحقاف: ١٥]

“আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধ পান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার ওপর যে নি'আমত দান করেছ, তোমার সে নিয়ামতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং

আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ১৫]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : [أمك] . قال : ثم من ؟ قال : [ثم أمك] . قال : ثم من ؟ قال : [ثم أمك] . قال : ثم من ؟ قال : [ثم أبوك]»..

“এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সুন্দর ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, তোমার মা, বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপর তোমার মা, লোকটি আবারো জিজ্ঞাসা করলেন

তারপর কে? বললেন, তাপরও তোমার মা, তারপর সে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারপর তোমার পিতা।”[10]

৪. ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক ও আইনি অধিকার নিশ্চিত করেছে।

ইসলাম নারীদের জন্য স্বয়ং-সম্পন্ন অর্থনৈতিক লেনদেন করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একজন হালাল পন্থায় অর্থ সম্পদ উপার্জন করতে চাইলে ইসলাম তাতে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করে নি। বেচা কেনা হেবা দান করা ব্যবসা-বাণিজ্য, রেহান বন্দক ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলো ইচ্ছা করলে একজন নারী পর্দার মধ্যে থেকে অনায়াসে করতে পারে। তা সত্ত্বেও ইসলাম তার ওপর

[10] সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব

তার নিজের কিংবা ছেলে সন্তানদের ভরণ পোষণের কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়নি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ ....﴾ [النساء : ٣٢]

“... পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩২]

ইসলাম নারীদের জন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে যাতে তারা তাদের নিজেদের পক্ষে আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বিচারাধীন বিষয়ে বিচারক নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং নারীরাও কোনো বিচারাধীন বিষয়ে পুরুষের মতো সাক্ষী হতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن

"আর ﴿فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٣٢﴾ [النساء : ٣٢]
তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সে সবের, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩২]

তিনি আরও বলেন,

﴿....... وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ ....﴾

[البقرة: ٢٨٢]

"...আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দুইজন সাক্ষী রাখ। অতঃপর যদি তারা উভয়ে পুরুষ না হয়,

তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী- যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর। যাতে তাদের (নারীদের) একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয়। সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে, যখন তাদেরকে ডাকা হয়। আর তা ছোট হোক কিংবা বড় তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে তোমরা বিরক্ত হয়তো না"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮২]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা নারীদের জন্য উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে তাদের অধিকার নিশ্চিত করছে। অথচ ইসলামের পূর্বে নারীদের তাদের পৈত্তিক সম্পত্তি ও মিরাস হতে বঞ্চিত করা হত। তাদের কোনো সম্পত্তি দেওয়া হত না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧﴾

[النساء : ٧]

“পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ (তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক) নির্ধারিত হারে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١﴾ [النساء : ١١]

“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের

সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ, আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিশ হয় তার মাতা-পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১]

আল্লাহ এ আয়াতে নারীদের জন্য পুরুষের অর্ধেক সম্পদ দেওয়ার কথা বলেছেন, তার কারণ হলো, একজন পুরুষের দায়িত্ব হলো, সে তার পরিবারের জন্য খরচ করবে, তাদের যাবতীয় বিষয়ে দেখা শোনা করবে এবং তাদের দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। এ কারণেই তাকে নারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার ও শক্তিশালী বলা হয়েছে। একজন স্ত্রী সে তার স্বামীর থেকে মোহরানা পেয়ে থাকে; যদি সে তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়, তাহলে অর্ধেক মাহর আর যদি পরে তালাক দেয়, তাহলে পূর্ণ মাহর পাবে। সুতরাং একজন নারী সে একজন পুরুষের অর্ধেক সম্পদ পেলেও কিন্তু দায়িত্ব কম থাকায় তার ব্যয়ের খাত মোটেই নাই এবং সে স্ত্রী হিসেবে মাহর ও মা হিসেবে পিতার চেয়ে বেশি পাওয়াতে তার হকের মধ্যে কোনো প্রকার কমতি করা হয় নি। তাদের মোহরের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤﴾ [النساء : ٤]

“আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪]

নারীদের প্রতি ইসলামের সুবিচার:

নারীদের প্রতি ইসলামের সুবিচারের বহি:প্রকাশ হলো, ইসলাম যুদ্ধের ময়দানে বৃদ্ধা ও শিশুদের ন্যায় নারীদের হত্যা করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া তাদের ঋতুবতী ও প্রসূতি হওয়াকালীন তাদের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশা করা বৈধ করেছে (সহবাস ব্যতীত)। তাদের সাথে ঐ সময় কোনো প্রকার বৈষম্য করাকে ইসলাম সমর্থন করে না। যেমনটি জাহেলিয়্যাতের যুগে কতক সম্প্রদায়ের লোক, ইয়াহূদীরা ও আরও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নারীদের সাথে বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য করত।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন,

«كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فِيَّ»

“আমি ঋতুবতী অবস্থায় একটি পাত্র থেকে পানি পান করতাম। তারপর একই পাত্রটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি পান করতে দিলে, তিনি তা দিয়েই পানি পান করতেন এবং পাত্রের যে স্থানে আমি আমার মুখ রাখতাম তিনি ঠিক সে স্থানেই মুখ রাখতেন।

তিনি আরও বলেন,

«وكان يتكئ في حجرها وهي حائض رضي الله عنها ويقرأ القرآن».

“ঋতুকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোলে হেলান দিয়ে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।”

৫. জিহাদ হিজরত ও ইজারার ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের অধিকার সমুন্নত রেখেছেন।

ইসলামে যেভাবে পুরুষরা হিজরত করেছে অনুরূপভাবে নারীরাও হিজরত করার সুযোগ পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ۚ .....﴾ [الممتحنة : ١٠]

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কাছে মুমিন মহিলারা হিজরত করে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখ। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন মহিলা, তাহলে তাদেরকে আর কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিও না। তারা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য হালাল নয়। তারা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না, যদি

তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। আর তোমরা কাফির নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখ না, তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা তোমরা ফেরত চাও, আর তারা যা ব্যয় করেছে, তা যেন তারা চেয়ে নেয়। এটা আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [সূরা আল-মুমতাহিনাহ, আয়াত: ১০]

যুদ্ধের ময়দানে মহিলাদের এমন কিছু ভূমিকা রয়েছে, যা একজন পুরুষ লোকের দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়। ফলে পুরুষের সাথে নারীরাও যুদ্ধ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

যেমন, বর্ণিত আছে উম্মে আতীইয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাতটি যুদ্ধ করেছেন, তিনি তাদের ছওয়ারীর পিছনে ছিলেন, তাদের জন্য খাওয়ার তৈরি করতেন এবং তাদের কেউ

আহত হলে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন ও তাদের পট্টি লাগাতেন।

«وكذا أم سليم بنت ملحان كانت حاملاً يوم حنين ومعها خنجر بيدها فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم :"أم سليم ؟ "وتجيب : بنعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله اقتل الذين ينهزمون عنك !! فإنهم لذلك أهل ! ويسألها زوجها أبو طلحة عن الخنجر الذي معها فتقول : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه».

"অনুরূপভাবে উম্মে সুলাইম বিনতে মালহান রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন। তার হাতে একটি বর্ম ছিল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উম্মে সুলাইম বলে ডাক দিলে তিনি উত্তরে বলেন হ্যাঁ হে রাসূল! আপনার উপর আমার মাতা পিতা কুরবান হোক। আমি যারা আপনার থেকে পলায়ন করে আসে তাদের হত্যা করব। কারণ, তারা এরই উপযুক্ত।

তার স্বামী আবু তালহা তাকে তার বর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমার নিকট দিয়ে যদি কোনো কাফের অতিক্রম করে, তখন তার পেটে আঘাত করার জন্য আমি এ লাঠি নিয়ে এসেছি।

«وقل مثل ذلك في حق صفية بنت عبد المطلب يوم الأحزاب وأم عمارة وكعيبة الأسلمية وخولة بنت الأزور !!»

"অনুরূপভাবে সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব আহযাবের যুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। উম্মে আম্মারা কুয়াইবাতুল আসলামিয়্যা ও খাওলা বিনতে আযওয়ার প্রমুখ নারী সাহাবীগণ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অনেক নারীদের দেখা গেছে তারা আমানত গ্রহণ করতেন এবং বন্ধক রাখতেন। তাদের আমানত ও বন্ধক রাখাতে কোনো বাধা ছিল না, বরং তাদের আমানত রাখা ও বন্ধক রাখাও গ্রহণ যোগ্যই ছিল।

ইসলাম নারীদের শুধু পুরুষের মতই সমান মর্যাদা দিয়ে ক্ষান্ত হননি, বরং ইসলাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষের চেয়েও অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে নারীদের নামে একটি সূরা নাযিল করেছেন। নারী যখন মা হয় তখন সন্তানের জন্য জান্নাতকে তাদের দু পায়ের তলে রেখেছেন। আর ইসলাম নারীদের সাথে সদাচরণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছে তিন বার আর পুরুষদের প্রতি দিয়েছে একবার। কোনো মহিলা সন্তান প্রসবের সময় মারা গেলে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে।

৬. আর পুরুষের মতো নারীদেরও মতামত দেওয়া ও পরামর্শ দেওয়ার অধিকার রয়েছে। যখন তারা কোনো গ্রহণ যোগ্য মতামত দেবে তখন তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বিভিন্ন সময় পরামর্শ চাইলে তিনি তাকে বলেছিলেন:

«والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق»

"আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবে না। কারণ, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখেন। সত্য কথা বলেন, অসহায় মানুষের সহায়তা করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ে সাহায্য করেন।"

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার পরামর্শ গ্রহণ করে আমল করতে আরম্ভ করলে আল্লাহ তা'আলা তার পরামর্শের মধ্যে বরকত ও কল্যাণ দান করেন।

‘নারী: ইসলামের পূর্বে ও পরে’ গ্রন্থটিতে একজন নারীকে ইসলাম কী কী সম্মান দিয়েছে এবং ইসলামের আগমনের পূর্বে নারীদের অবস্থা কী ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে একজন পাঠক বুঝতে পারবে যে, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা কী?